মধু কান ও তাঁর ঢপপালা

বিষ্ণু বসু

[বিষ্ণু বসুর জন্ম অবিভক্ত বাংলার ঢাকা শহরে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর কলকাতায় আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., পি. এইচ. ডি.। কলকাতা মহাকরণ, বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজে কাজ করেছেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যবিভাগে অধ্যাপনাও করেছেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। পিতৃসূত্রে নাটক ও থিয়েটারের প্রতি আগ্রহ। কিছুকাল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একটি শাখার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। নাটক ছাড়াও সাহিত্য ও শিল্পের নানা বিভাগে তাঁর আকর্ষণ। নাট্য বিষয়ক প্রবন্ধের বই ছাড়াও কিছু পূর্ণাঙ্গ ও একাংক নাটক লিখেছেন। বহু গুরুত্বপূর্ণ বই সম্পাদনা করেছেন। একাধিক বিদেশি নাটকরে ভাষান্তর করেছেন। এখনও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখে থাকেন। তাঁর লেখা প্রকাশিত প্রবন্ধের বই - বাংলা নাট্যরীতি, বাবু থিয়েটার, রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার, রাজনীতি নাটকে রাজনীতি থিয়েটারে, ধনঞ্জয় বিরচিত দশরূপক (অনুবাদ ও টীকা) প্রভৃতি; রম্যরচনা - থিয়েটারের গালগল্প, ইতিহাসের কলকাতায় ; নাটক - মান্যবর ভুল করছেন, থিয়েটারের মেয়ে ও অন্যান্য একাংক। এই প্রবন্ধটি গণমন প্রকাশনা দ্বারা প্রকাশিত তাঁর 'থিয়েটার ভাবনা' গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে।]

মধ্যযুগের বঙ্গদেশের যে সকল নাট্য রীতি প্রচলিত ছিল, ড. সেলিম আল দীন যাদের নাম দিয়েছেন 'কথনাট্য', তাদের মধ্যে অন্যতম হল 'ঢপ'। অবশ্য ঢপগান অথবা ঢপকীর্তনকে পুরোপুরি মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত করা চলে কিনা, তা নিয়ে কিছু সংশয় জন্মাতে পারে। কিন্তু ঢপকীর্তনের প্রধান লেখক মধু কান বা মধুসুদন কিন্নর উনিশ শতকে আর্বিভূত হলেও ঢপের উৎপত্তি আরও আগে। প্রকৃতির দিক থেকে ঢপকে মধ্যযুগীয় আঙ্গিক বলেই মেনে নেওয়া উচিত।

আঙ্গিক নিয়ে আলোচনার আগে ঢপকীর্তনের উৎপত্তি ও তার শ্রেষ্ঠ পালাকার মধুকানকে নিয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে।

'ঢপ' শব্দটির উৎস নির্দেশে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দী 'ঢব' শব্দের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁকে তথ্য জুগিয়েছে বিশ্বকোষ। 'বিশ্বকোষে' বলা হচ্ছে ঢপের অর্থ হল 'রকম'। অর্থাৎ 'ঢপ' যথার্থ কীর্তন নয়, কীর্তনের 'রকম' বা মতো। হিন্দি 'ঢব' শব্দটির অর্থও হল 'ঢঙ, রীতি বা ধরন'। তবে বাংলার নিজস্ব সংগীত কীর্তনের সঙ্গে হিন্দী 'ঢপ' কী করে মিলল তা নিয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান বইটির মধ্যে 'ঢপ' শব্দের অন্য অর্থও দেওয়া আছে। সেখানে 'ঢপ' শব্দটির অর্থ হল 'সৌন্দর্য'। আবার 'ঢপ' করা অর্থে 'রঙ্গ-করা'-ও বলা হয়েছে। কাজেই এমন ধারণা গনে নেওয়া কি অসঙ্গত যে তখনকার শ্রোতারা যে পালাগানকে নিজস্ব ধরন ও চি অনুযায়ী সৌন্দর্য মণ্ডিত বলে ভাবতেন তারই নাম দেওয়া হয়েছিল 'ঢপ-কীর্তন'। তাছাড়া প্রচলিত কীর্তনের গভীরতা ও গাম্ভীর্য থেকে মুক্তি পেতে যে ধরনের কীর্তনের মধ্যে কিছু রঙ্গ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল তাকেই অভিহিত করা হত 'ঢপ-কীর্তন' নামে--- এমন অনুমানও হয়ত ভুল নয়।

'ঢপ' কীর্তনের উদ্ভব আঠার শতক বা তার আগে হলেও এ ধারার শ্রেষ্ঠ পালাকার মধুসুদন কিন্নর তথা মধু কানের আবির্ভাব উনিশ শতকে। কেউ কেউ 'কান' পদবীটিকে ঢপগায়কদের নিজস্ব বলে মনে করেন। তাঁরা ভাবেন ঢপগায়কদের সকলকেই 'কান' বলা হত। গেরাসিম লিয়েবেদভের 'কাল্পনিক সংবদল' নাটকে 'কান' চরিত্রের উপস্থিতির দণ তাঁদের ধারণা ঢপ গায়করা এ নাটকে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু এ অনুমান ঠিক নয়। মধুসুদনের পদবী পিতৃদত্ত। মধু কানের বাবার নাম ছিল তিলকচন্দ্র কিন্নর। তিনি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না। মধুসুদন কিন্নরই মধু কান নামে পরিচিত হয়েছিলেন। জনসাধারণের আদরে 'কিন্নর' 'কান'-এ পরিণত হয়েছিল। কাজেই 'কাল্পনিক সংবদল' এ ঢপগায়কদের অংশ নেবার কথা সঠিক নয়। কেননা 'কান' পদবীযুক্ত মধুর জন্ম প্রায় দুদশক পরের ঘটনা। প্রসঙ্গত বলা যায় মধুর শ্বশুরের পদবীও ছিল কিন্নর। তিনি ঢপ গায়ক ছিলেন না।

মধুসুদন কিন্নর তথা মধু কানের জন্ম ১২২৫ সালে উলুশিয়াই গ্রামে। এ গ্রামটি তখন ছিল যশোর জেলার বনগ্রাম মহকুমায়। মধুসুদন তিলকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর কনিষ্ঠ আরও তিনটি ভাই ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল যাদবচন্দ্র, শশীভূষণ ও তারকনাথ। ভাইদের নামকরণে বৈষ্ণবপ্রভাব ধরা পড়ছে। দারিদ্রের দণ বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি মধু। কথিত আছে, তিনি নাকি সামান্য পড়তে পারতেন, লিখতে একেবারেই পারতেন না। কিন্তু তাঁর রচিত পালা গানে অশিক্ষার স্বাক্ষর নেই, বরং সেকালের প্রথামাফিক বিদ্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাল্যকাল থেকেই তি নি গান লিখতে প ারতেন। যৌবনে তাঁর সংগীত শিক্ষক ছিলেন প্রসিদ্ধ রাগসংগীত শিল্পী ছোটে খাঁ। এরা দুজনেই ছিলেন সেকালের ঢাকা শহরের অন্যতম সেরা সংগীত শিল্পী। ধ্রুপদী গানে তালিম নেওয়ার পর মধুসুদন চলে আসেন যশোরে। এ জেলার রাঢ়খা দিয়া গ্রাম নিবাসী রাধামোহন বাউলের কাছে তিনি শেখেন ঢপসংগীত। প্রচলিত ঢপগানের সঙ্গে ধ্রুপদী রাগরাগিনী মিলিয়ে তিনি রচনা করলেন নতুন ধরনের ঢপ পালা যা পরিচিত হল মধু কানের 'ঢপকীর্তন' বলে।

মধু কান রচিত মোট চারটি পালা পাওয়া গেছে। তাদের নাম যথাত্রমে---কলঙ্ক ভঞ্জন, অত্রুর সংবাদ, মাথুর ও প্রভাস। শেষের পালাটি কুপ্রভাস নামেও পরিচিত।

মধুসুদন দীর্ঘজীবি ছিলেন না। ১২৭৫ সালে (১৮৬৮ খ্রীঃ) তিনি কৃষ্ণনগরে গান করতে গিয়ে যকৃত ও বুকের বেদনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চান্ন বছর। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১২৮০ সালে। মধুসুদন দুবার বিয়ে করেছিলেন। দুটি স্ত্রীই ছিলেন নারায়ণ কিন্নরের কন্যা। মৃত্যুকালে মধুসুদনের এক ছেলে ও দুই মেয়ে বর্তমান ছিল।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর তাঁর ভগিনীরা নাকি ত মার দল বেশ কিছুদিন চালিয়েছিলেন বলে হরিসাধন মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন। এখানে ভগিনী বলতে বোধহয় তাঁর দলের কিছু মহিলা শিল্পপীর কথাই বলা হয়েছে।

মধুসুদনের মৃত্যুর প্রায় আঠার বছর পরে ১২৯৮ সালে প্রসন্নকুমার দত্ত ৫৪/১ কলেজ স্ট্রীট থেকে তাঁর চারটি পালা প্রক াশ করেন। বইটির সম্পাদনা করেছিলেন মহিমচন্দ্র বিশ্বাস। ১৩১২ সালে দূর্গাদাস লাহিড়ী 'বাঙ্গালির গান' নামে যে বৃহৎ গীতি সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন তাতে মধু কানের ১২৬টি গান গৃহীত হয়েছে। মন্মুলাল মিশ্র ১৩৩৯ সালে মধু কানের পালা প্রকাশ করেছিলেন। ১৩৪৩ সালে পাঁচকড়ি দে মধুসুদন কিন্নরের ঢপকীর্তন প্রকাশ করেছিলেন। বইটির প্রক াশক ছিল 'পাল ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী', বানী পীঠ ৫/১ বিবেকানন্দ রোড। এ সংকলনে কলঙ্কভঞ্জন, অত্রুর সংবাদ, ম াথুর ও প্রভাস নামে চারটি পালা রয়েছে। এখানে এ পালাসমূহ অভিহিত হয়েছে 'গীতকথিকা' নামে।

'গীতকথিকা' অথবা 'ঢপকীর্তন'-নাম যাই হোক না কেন মধু কান এ পালা পরিবেশন করতেন অভিনয়ের রীতিতে। মধুর দলে তাঁর পরিবারের লোকেরাও ছিলেন। তাছাড়া বেশ কিছু স্ত্রী পুষ শিল্পী তাঁর দলে ছিলেন বলে জানা যায়।

আরেকটা কথাও বোধহয় বলা যায় এ প্রসঙ্গে। উনিশ শতকের কলকাতায় বাবুদের বাড়িতে যখন শু হল ইংরেজি ধাঁচের থিয়েটার, সেখানে স্ত্রী ভূমিকায় মহিলা শিল্পীদের অংশ নিতে বেশি দেখা যায় নি। ব্যতিত্রম শুধু ছিল ১৮৩৫-এ বাগবাজ ারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয়। এমনকি, আঠার শতকে সাহেব পাড়ার থিয়েটারেও মহিলা শিল্পীদের দেখা পাওয়া গেছে কদাচিৎ। তুলনায় কিন্তু যাত্রাপালা, ঝুমুর, ঢপকীর্তন প্রভৃতি প্রদর্শশিল্পে শুধু কলকাতায় কেন, সুদুর মফঃস্বলেও মহিলাদের সত্রিয় অংশগ্রহণ খুবই চালু ছিল। অবশ্য কলকাতার চেহারাও তখন অনেকটাই গ্র াম্য ছিল, শিল্পসংস্কৃতিও তখন সবটাই কলকাতা অভিমুখী হয়ে ওঠেনি। গ্রাম-বাংলায় যে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি বজায় ছিল তারই উপসত্ত্বে গঠিত হয়ে চলছিল নগর কলকাতা। গ্রাম ও শহরের শিল্প প্রকরণের বিভাজন কখনও ঘটে ওঠেনি। এ বিভ াজন রচিত হয়েছে পুরো উনিশ শতক ধরে ইংরেজি শিক্ষার আওতায় এসে। তাই কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজ ও তার অর্থনীতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল যে সকল শিল্পকলা সামান্য অদল বদল ঘটিয়ে তাদেরই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল শহর কলকাতার আদি পর্বে। তাই যাত্রাপালা থেকে শু করে ঝুমুর, ঢপ, কীর্তন, গ্রামে ও শহরে অবাধে যাতায়াত করতে পেরেছিল। কলকাতার আদিপর্বে কবিগান, আখড়াই, টপ্পা প্রভৃতির মধ্যেও গ্রাম শহরের এ মিলমিশ নিতান্ত অলক্ষ্য থ াকেনি।

এর থেকেই ঝুমুর, যাত্রাপালা বা ঢপকীর্তনে মহিলাদের সংযোগের কারণটি বোঝা যায়। আমাদের গ্রামীণ কৃত্য অনুষ্ঠানে পুষ ও মহিলার মিশ্র সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। বেশ কিছু অনুষ্ঠান রয়েছে যা পুরোপুরি মহিলাদের দিয়েই সংগঠিত হত।

মনে রাখতে হবে আমাদের মূল অর্থনীতি কৃষিনির্ভর এবং কৃষিও পুষ নারীর যৌথ শ্রমের ফসল। তাই স্বভাবতই এসব অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকের অংশগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী ছিল। তারপর অনুষ্ঠানের অন্তর্গত গান ও অভিনয় (যাকে বলা হয় কৃত্য অভিনয়) ক্রমে আচারের থেকে স্বতন্ত্র হলেও স্ত্রীলোকদের তাতে অংশ নেওয়া বন্ধ হয়নি। তথাকথিত শিষ্ট সমাজে গান, নাচ ও অভিনয়ে মহিলাদের সম্পৃক্ততা নিয়ে যে কোলাহল ও আলোড়ন উঠেছিল, তার বিরোধিতা করে যত বাকবিস্তার হয়েছিল তার থেকে যাত্রাপালা, ঝুমুর বা ঢপকীর্তনের মহিলা শিল্পীদের অবস্থান স্বতন্ত্র ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল। তাই মধু ক ানের দলে মহিলা শিল্পীর অপ্রতুলতা ছিল না এবং তাঁর তিরোধানের পর মহিলাদের পক্ষে ঢপের দল চালানো সম্ভব হয়েছিল।

এবার ঢপকীর্তনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এ সূত্র সমূহ গড়ে তোলা হয়েছে মধু কানের চারটি পালার উপর ভিত্তি করে। এই চারটি পালা হল--- কলঙ্কভঞ্জন, অক্রুর সংবাদ, মাথুর ও প্রভাস।

আগেই বলা হয়েছে দূর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' বইটিতে সংগৃহীত মধু কানের গানের সংখ্যা ১২৬। অবশ্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ সংখ্যা ১২৫ বলে উল্লেখ করেছেন। (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৪৭)। এ ১২৬টি গানের মধ্যে প্রায় সবগুলোই পাওয়া যায় মধু কানের পালায়। প্রসঙ্গত বলা যায় মধু কানের চারটি প ালায় মোট গানের সংখ্যা ১৩১। তার মধ্যে কয়েকটি দুর্গাদাসের সংগ্রহে নেই। অবশ্য থাকার কথাও নয়। কেননা তাঁর বইটি গীতিসংকলন, পালা সংকলন নয়।

মূল আলোচনার ঢোকার আগে ১৮/১৯ শতকে বাংলার পালাকার ও গীতিকারদের অবস্থান একটু বুঝে নেওয়া যাক। সমকালীন নামী গীতিকারগণ হলেন ---

১) নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত --- টপ্পা (১৭৪১-১৮৩৯)
২) গোবিন্দ অধিকারী --- যাত্রা (১৭৯৭-১৮৭০/৭১)
৩) দাশরথী রায় --- পাঁচালী (১৮০৬-১৮৫৭)
৪) কৃষ্ণকমল গোস্বামী --- যাত্রা (১৮১০-১৮৮৮)
৫) রূপচাঁদ পক্ষী ---- গান (১৮১৫-আটের দশক?)
৬) মধু কান ---- ঢপ (১৮১৮-১৮৭৩?)
৭) গোপাল উড়ে --- যাত্রা (১৮১৯---?)

এই তালিকায় হয়ত যুক্ত হতে পারেন আরও কেউ কেউ। কবি, আখড়াই, হাফ-আখড়াই রচয়িতাদের প্রসঙ্গও মনে আসা কঠিন নয়। ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে উনিশ শতকের কলকাতায় গড়ে উঠেছিল যে শিল্প ও সাংস্কৃতিক চেতনা, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের অবদান ছিল তার সমান্তরালে। রবীন্দ্রনাথ কবিগানকে অশ্রদ্ধা করলেও নিধুবাবুর প্রতি দূর্বলতা দূর করতে পারেন নি আজীবন। বস্তুত শুধু নিধুবাবু কেন, বাংলাগানের বিবর্তনে উল্লিখিত ব্যক্তিদের অবদান ও প্রভাবকে অস্ বীকার করা যায় না কোনমতেই। মধু কানের গানও এ ঐতিহ্যের অন্তর্গত।

মধু কানের চারটি পালায় যে ১৩১ গান রয়েছে তার সবগুলিই রাগাশ্রিত যদিও তার বাঙালি চেহারা ও মেজাজ চাপা পড়ে নি। কিন্তু বর্তমানে আলোচ্য তার গান নয়, তাদের নাট্যরীতি। গানের বিষয়ে মন্তব্য করার অধিকার বর্তমান লেখকের নেই ।

মধু কানের ঢপকীর্তন পালায় চারটি অংশ রয়েছে। এ চারটি অংশ হল কথা, ধুয়া, অভিনয় ও গান। মূল পালাকার শু করেন কথা দিয়ে। কথা হল কাহিনীর উত্থাপক ও সংযোজক। কথার সুত্র ধরে আসে ধুয়া। ধুয়াতে থাকে বিষয়ের নির্যাস এবং পরিবেশের বর্ণনা। ধুয়াকে অবলম্বন করে অভিনয়ের শু। প্রবেশ ঘটে পাত্র-পাত্রীদের। তাঁরা সংলাপ বলেন ও গান করেন। এভাবে ক্রমাগত প্রবাহিত হতে থাকে পালাটি।

'কলঙ্কভজন' পালাটির কথাই ধরা যাক। অধিকারী পালা আরম্ভ করলেন এ কথাগুলি বলে--

"শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে গৌরবিনী। তাহাকে গুজনগণ শ্যাম কলঙ্কিনী বলে গঞ্জনা দেয়, তাইতে একদা তিনি অভিসারে গমন না করে অভিমান বশত মনে মনে বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ আমার এ কলঙ্ক না ঘুচাবেন, ততক্ষণ আ মি শ্যাম দরশনে যাব না। তুমি ---"

অধিকারী এ পর্যন্ত বলে থামলেন এবং গানের দল ধুয়া ধরলেন,
"বাঞ্ছা কল্পত নাম ধর।
মনের সাধ পুরাতে পার।।"
গানের দলের সমবেত সংগীতে আসর জমে উঠল। শ্রোতারা নড়ে চড়ে বসলেন। প্রস্তাবনার এ অংশটুকুর মধ্য দিয়ে ছবিটি পরিষ্কার হল। মনে রাখতে হবে এ পালার আসরে দৃশ্য সাজানো ও পট পরিবর্তনের কোনও সুযোগ নেই। তাই বর্ণনার মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তুলতে হবে পরিবেশ। উদ্ধৃত অংশটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাচ্ছে --- (১) স্থানের পরিচয় অর্থাৎ বৃন্দাবন। (২) পাত্র-পাত্রী --- রাধা, কৃষ্ণ ও অন্যান্য। (৩) বিষয় --- রাধাকৃষ্ণের প্রণয়। সেই সঙ্গে পালায় কয়েক জন অংশগ্রহণকারীরও দেখা মিলল।অধিকারী ও গানের দল আত্মপ্রকাশ করেছেন। এবার নটনটীদের পালা।
ধুয়ার পরেই 'কথা' শু হল। কথাকার বললেন,
"তখন শ্রীরাধিকা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া নির্জনে কক্ষে বসলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে সঙ্গে লয়ে রাধাকুণ্ডের তীরে গিয়া দেখেন তখনো শ্রীরাধিকার আগমন হয় নাই। অভিসারের সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। তখন সুবলকে সখেদে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, 'সুবল! রাধা বিনা আমার প্রাণ বাঁচে না।' এই বলে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন---"
এ অংশটি কিভাবে পরিবেশিত হত? এমন হতে পারে রাধার নির্জন কক্ষে গিয়ে বসবার কথা এবং সুবলকে নিয়ে কৃষ্ণের রাধা অন্বেষণ যখন কথাকার বলছেন তখন রাধা কৃষ্ণ ও সুবলের ভূমিকা যাঁরা নিয়েছেন, বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মুকাভিনয় করছেন অর্থাৎ রাধা নির্জন কক্ষে বসেছেন এবং কৃষ্ণ সুবলকে নিয়ে রাঁধা খুঁজছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে অভিনেতা অভিনেত্রীরা মঞ্চের উপরেই কি বসে ছিলেন বা থাকতেন? যেমন দেখা যেত নানা গ্রামীণ নাট্যরীতিতে? যখন যাঁর অভিনয়ের পালা আসত নিজের অংশটুকু বলে আবার বসে পড়তেন আসরের পাশে, গায়কদের সঙ্গে? গায়কদলের সঙ্গেই গান ধরতেন কি তাঁরা? নাকি, যাত্রাপালার মতো অভিনেতা অভিনেত্রীদের আগমন প্রস্থান ঘটত আসরের আড়াল থেকে, আসরের নেপথ্যে? মনে হয় প্রথম কৌশলটিই অবলম্বন করা হত বেশীর ভাগ সময়।
যাই হোক্ 'কৃষ্ণ সুবলকে বলেন'--- এখানে শু হল আবার ধূয়া, এবারে কৃষ্ণের। তিনি ধূয়া ধরলেন ---
"এই স্থানে বস তুমি।
বৃন্দের কুঞ্জে যাই আমি।।"
এই ধুয়াই সম্ভবত নিজের গলায় তুলে নিলেন মূল গায়েন। ধূয়া শেষ হতেই আবার শু হল কথা। কথক বললেন, "তখন কাঙ্গালের ন্যায় বৃন্দের মদনকুঞ্জে উপস্থিত হয়ে" --- এবারে শু হল অভিনয়--- শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা যে অভিনেতা নিয়েছেন তিনি আসরে এসে অর্থাৎ মদনকুঞ্জে উপস্থিত হয়ে বললেন,
"বৃন্দে, অদ্য অভিসারের সময় হয়ে গেছে। আমার প্রাণবল্লভ রাধিকা এখনও এলেন না কেন? নয়নের তারা আমার রাধিকা সুন্দরী, এক তিন না হেরিলে রহিতে না পারি। অতএব তুমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি উত্তর দেন?"
ইতিমধ্যে আসরে এসেছে বৃন্দা। তিনি কৃষ্ণের কথার উত্তরে বললেন, "যাও-যাও, আমি নিত্য নিত্য গিয়ে ওসব কথার জন্য সাধ্য সাধনা করতে পারব না।" একথার মধ্য দিয়ে শু হল উক্তি-প্রত্যুক্তি, থেসপিসের বাঁধন কাটিয়ে প্রবেশ করল দ্বিতীয় চিরিত্র, নির্মিত হল নাটক। অবশ্য এক বিশেষ ধরনের নাটক।
সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বৃন্দার কথা শেষ হল না। তিনিও ধূয়া ধরলেন---
"তোমরা মান করিবে দুজনায়।
আমার সাধিতে যে প্রাণ যায়।।"
অনুমান করা যায় বৃন্দার কণ্ঠের এ ধূয়া উঠে এল গায়েনদের গলায়। গীতবাদ্য স্তিমিত হলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,
'বৃন্দে, তুমি আমার এ দুঃখের সময় এমন কথা বললে? অতএব তুমি এরূপ বোলো না।' বলেই সুর ধরলেন,
তোমা বিনা কে মোর আছে।
বল তোমা বই যাব কার কাছে।
এবারে এগিয়ে চলল কলঙ্ক ভঞ্জন পালা। তবে খুব যে একটা কাহিনীগত সরলপথ অনুসরণ করল তা নয়। বৃন্দার সঙ্গে কিছু কপট কলহের পর কৃষ্ণ তাকে রাজি করালেন রাধা সমীপে যেতে। রাধা এদিকে মান করে বসে আছেন। তাঁর অনুযে

াগ কেন তাঁর কুল কলঙ্কিনী বলে বদনাম হবে? কৃষ্ণ তাঁর এ বদনাম না ঘোচালে তিনি অভিসারে যাবেনা না। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মিলনও হবে না। কৃষ্ণ একথা জেনে অসুস্থ হবার ছলনা করলেন। বৈদ্য, এসে তখন বিধান দিলেন, কোনও সতী নারী ছিদ্র সমন্বিত কলসে জল ভরে এনে দিলে, সে জলের সংযোগে কৃষ্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। সতী রমনী বলে বৃন্দাবনে যাঁদের অহঙ্কার ছিল, এমনকি সেই জটিলা-কুটিলাও এমন অসম্ভব কার্যে ব্যর্থ হলেন। তখন বৈদ্যের আদেশ ও যশোদার প্রার্থনায় রাধা সেই ছিদ্র কুম্ভে জল ভরে আনলেন। কৃষ্ণ সুস্থ হলেন।

এ সরল কাহিনীকে কবি কিন্তু তরঙ্গময় করে তুললেন নানা কৌশলে। কেননা প্রথমত প্রায় প্রসঙ্গ ছাড়াই রাধা অবতারণা করলেন অহল্যা উপাখ্যানের। অহল্যা কিভাবে রামের পদস্পর্শে পাষাণ থেকে মানবী হয়ে উঠলেন তাঁর বর্ণনা এল। ঠিক বর্ণনা নয়। রাধা এ প্রসঙ্গ তুলতেই দেখা গেল অহল্যা মঞ্চে এসেছেন, গৌতমের সঙ্গে তাঁর সংলাপ হচ্ছে। গৌতম অহল্যার পাপমোচনের বিধান দিচ্ছেন এভাবে---

"ত্রেতাযুগে সূর্যবংশীয় রাজা দশরথের ঘরে ভগবান বাসুদেব যখন রামরূপে জন্মগ্রহণ করবেন আর বিশ্বামিত্র ঋষি যজ্ঞরক্ষার জন্য রামলক্ষণকে লয়ে যাবেন ঐ সময় রামচন্দ্রের চরণরেণুতে তুমি মানবী হবে।"

দেখা যাচ্ছে পালাকার অত্যন্ত অবলীলায় কৃষ্ণ কাহিনীতে রামায়ণের সংযোগ ঘটিয়ে দিলেন। কিন্তু এর বাহ্য। আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় হল কথাকারের কৌশলে পালার মধ্যে পালা শু হয়ে গেল। গৌতমের এ সংলাপের সূত্র ধরে কথাকার বললেন, "হেথায় অযোধ্যা নগরীতে ভগবান রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন। কিছুদিন পরে বিশ্বামিত্র ঋষি একটি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ইত্যাদি।" দ্বাপরের মধ্যে ত্রেতা এসে গেল অক্লেশে। আসরে এলেন বিশ্বামিত্র, রাজা দশরথ ও লক্ষণ। তাড়কা বধ হল। অহল্যা মুক্তি পেলেন। এমনকি পদস্পর্শে জনৈক নাবিকের নৌকাও সোনা হল। "গঙ্গাদেবীও একটি সিংহাসন মস্তকে লয়ে রামের চরণের নিকটে গমন করিতে লাগিলেন।"

কাহিনীর অলৌকিকতায় দর্শক বা শ্রোতারা অবশ্যই মুগ্ধ হলেন, যদিও কাহিনী কিছু নতুন নয়। কৃষ্ণ অথবা রামের এ মাহাত্ম্য সাধারণ বাঙালির অজানা নয়। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এ পরিচিত কাহিনী পালাকার ত্রেতা ও দ্বাপরকে মিলিয়ে দিচ্ছেন। তার ফলে পালার গ্রন্থনে এসে যাচ্ছে বৈচিত্র্য। পরিবেশনাতেও নতুনত্ব অলক্ষ্য থাকছে না। চরিত্রের প্রতুলতার সঙ্গে প্রকাশের তির্যকতাও বাড়ছে। আয়োজনের আড়ম্বর না করেও দর্শক বা শ্রোতার প্রাপ্তিকে দেওয়া হচ্ছে গুত্ব।

'কলঙ্কভঞ্জন' পালায় আরেকটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করবার মতো। কৃষ্ণ অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন। বৈদ্যকে আনবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন স্বয়ং যশোদা। অন্য কোনও বৈদ্য এসে যদি জটিলতা মোচন করে দেন, তাই কৃষ্ণ একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। নিজের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি বৈদ্য হলেন। এক কৃষ্ণ অসুস্থ হয়ে শায়িত, অন্য কৃষ্ণ বৈদ্যরূপে রোগীর অন্বেষণে ব্যগ্র। দর্শকরা এখানে দেখতে পেলেন কৃষ্ণের দ্বৈতরূপ। ভক্তিরসের দিক থেকে তা কতটা উজ্জ্বল, তা নিয়ে আলোচনা এখানে করা হচ্ছে না। শুধু লক্ষ্যণীয় প্রযোজনার কৌশলটি। এ দৃশ্যে যিনি বৈদ্য সাজছেন তাকে কি কৃষ্ণের মতো দেখতে? নাকি, বৃদ্ধ বৈদ্য সাজিয়ে একটি বৈচিত্রময় দৃশ্য রচনা করা হল? যাই হোক না কেন, এখানে, নাট্যকৌশলটি স্বতন্ত্র্য অর্জন করছে বেশ স্বাভাবিকভাবেই।

শুধু যে মানুষী চরিত্র সৃজনে সব সময়ে তৃপ্ত থেকেছেন পালাকার, তা নয়। 'প্রভাস' পালায় দেখা যাচ্ছে অন্যতম চরিত্র হিসেবে হাজির হয়েছে শুক ও শারী। নারদ কৃষ্ণ অন্বেষণে এসেছেন। নন্দের আলয়ে এসে তিনি দেখলেন পুরী নির্জন। শুধু রয়েছে শুক ও শারী। তারাও চোখ বুজে বসে আছেন। নারদ বললেন, "শারী শুক, তোমরা নয়ন মেল।"

শুক বলছে, "নয়ন মেলে কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি? কৃষ্ণরূপ ভিন্ন অন্যরূপ দেখব না। কৃষ্ণ কথা ভিন্ন অন্য কথা শুনব না।" শারী তখন জিজ্ঞাসা করছে, "তুমি কি প্রকারে জানলে যে কৃষ্ণ এসেন নাই?"

এভাবে সংলাপ চলতে থাকে এবং নারদ তাদের গানের মধ্যে দিয়ে জানতে পারেন, "বৃন্দাবন শূন্য করে গেছেন বনমালী।" নারদ তাদের আশ্বাস দিলেন "তিন দিবসের মধ্যে কৃষ্ণকে দর্শন পাবে।" এ সংবাদ তো পালায় অনিবার্য। কিন্তু লক্ষ্যণীয় হল, দরকার হলে সংলাপ বলে ও গান করে 'ব্রজের পশুপাখী'। তার ফলে প্রযোজনায় নতুন 'ডাইমেনশন' এসে যাচ্ছে। পরিবেশনায় বিভ্রম রচনা করা এবং বিভ্রম ভেঙে ফেলা পালাকারের আদৌ কঠিন হচ্ছে না। আমাদের লৌকিক নাট্যে অ্যালিয়েনেশন তৈরি এভাবই সম্পন্ন হত অবলীলায়। অবশ্য এর সঙ্গে কেউ যদি আবার মিলিয়ে দিতে চান ব্রেখটীয় অ্যালিয়েনিশনকে তাহলে তাকেও বেশএকটু বেশি বলাই হবে।

'ঢপ কীর্তন' অথবা 'গীতি কথিকা' বিশ্লেষণ করে তাহলে আমরা উপনীত হতে পারি এ সকল সিদ্ধান্তে ঃ--

১. মধু কানের ঢপকীর্তন প্রচলিত যাত্রাপালা থেকে আঙ্গিক ও পরিবেশনায় পৃথক। কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা পালায় দেখা যায় চরিত্রগুলো সরাসরি চলে আসছে মঞ্চে; গানে ও সংলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে শু থেকেই। সেখানে কথা ও ধুয়ার কোনও ভূমিকাই নেই। কাহিনীও এগিয়ে চলেছে সরল পথে। একটি প্রসঙ্গে অন্য কোনও প্রসঙ্গ এসে overlapকরছে না। গোবিন্দ অধিকারীর 'চাঁদধরা' অথবা কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'দিব্যোন্মাদ' দেখলে এ সত্য ধরা পড়ে। প্রসঙ্গত আবার জানানো হচ্ছে মধু কান, গোবিন্দ অধিকারী ও কৃষ্ণকমল গোস্বামী ছিলেন সমসাময়িক।

২. গোবিন্দ অধিকারী ও কৃষ্ণকমল গোস্বামী যে সকল পালা লিখেছেন তা সাধারণভাবে পুরাণকে অবলম্বন করেছে, শুধুমাত্র কৃষ্ণকথায় আবদ্ধ থাকে নি। গোবিন্দ অধিকারীর পালাসমূহ যদিও 'কৃষ্ণযাত্রা' নামে প্রচলিত এবং তার বেশির ভাগ পালা কৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করে রচিত হলেও 'নিমাই সন্ন্যাস', 'মুক্তালতাবলী', 'অষ্টকালীর নিত্যলীলা' ও 'দেয়াশিনী মিলন' প্রভৃতি পালার মধ্যে দিয়ে ভিন্নতর চরিত্রের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। অবশ্য গোবিন্দ অধিকারীর পালার মধ্যে 'কলঙ্কভঞ্জন', 'অক্রুর সংবাদ', 'মাথুর' এ 'প্রভাস' অর্থাৎ মধু কানের সবগুলি বিষয়ই রয়েছে। কাজেই এসব জনপ্রিয় যাত্রাপালার সঙ্গে টক্কর দিয়ে মধু কানের স্বীকৃতি পাওয়া কম কৃতিত্বের ব্যাপার ছিল না। কৃষ্ণকমল অবশ্য কৃষ্ণকথায় আবদ্ধ থেকেছেন তুলনায় কম। তাঁর পাঁচটি পালার মধ্যে তিনটি --- 'স্বপ্নবিলাস', 'দিব্যোন্মাদ' বা 'রাই উন্মাদিনী' এবং 'বিচিত্রবিলাস'--- পালায় রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা প্রশ্রয় পেয়েছে।'ভারত মিলন' ও 'গন্ধর্ব্ব মিলন', কৃষ্ণকথাকে অগ্রাহ্য করেছে। গোবিন্দ অধিকারীর সতেরোটি পালার মধ্যে বারোটি কৃষ্ণবিষয়ক।

গোবিন্দ অধিকারী ও কৃষ্ণকমল গোস্বামী রচিত পালায় কৃষ্ণলীলায় বিভিন্ন পর্য্যায় ব্যক্ত হলেও তাদের মধ্যে তেমন পরস্পর সংলগ্নতা লক্ষ্য করা যায় না। মধু কান কিন্তু কৃষ্ণলীলাকে প্রকাশ করেছেন প্রায় একটা Cycle এর মতো। পর্যায় হিসেবে কলঙ্ক ভঞ্জন, অক্রুর সংবাদ, মাথুর ও প্রভাস পরপরই আসে। অনুরাগ, বিচ্ছেদ, বিরহ ও ভাবসম্মিলন --- বৈষ্ণবীয় রসের দিক থেকেও তার গুত্ব রয়েছে। মধ্যযুগের য়ুরোপে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে খ্রিস্ট জীবন অবলম্বনে যে সকল পুরাণ নাট্য প্রযোজিত হত তাতে From Creation to the last judjement পরিবেশিত হত। তার ফলে বিষয়ের মধ্যে একটি জৈব সমগ্রতা পাওয়া যেত। মধু কানের চারটি ঢপকীর্তন পালায় যে একশো একত্রিশটি গান আছে তাদের বিন্যাস এরকম ঃ কলঙ্কভঞ্জন পালায় ২৭টি গান, অক্রুর সংবাদ-এ ২৭টি, মাথুর-এ ৩৩টি এবং প্রভাস পালায় ৪৪টি। এ ছাড়া সংস্কৃতভাষায় লেখা গুটিকতক গান আছে এগুলোও সম্ভবত মধুরই লেখা।

মধু কানের পালায় গদ্য সংলাপের প্রয়োগও নিতান্ত কম নয়। বাংলা গদ্যের গঠন পর্বের সময়সীমায় রচিত এ ভাষা কতটা পৃথক বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছে তাও লক্ষ্য করার মতো। তবে আমাদের আলোচনায় এ বিষয়টি মূলতুবিই রাখা হয়েছে।

মধু কানের ঢপ পালার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তার রচনারীতি। মধ্যযুগে ঐতিহাসিক কারণে সংস্কৃত নাটক রচনা দুষ্প্রাপ্য হলে কিছু নতুন ধরনের নাট্যরীতি গড়ে উঠেছিল। নেপালে প্রাপ্ত প্রাচীন বাংলা নাটক অথবা প্রাচীন বাংলা-মৈথিলী নাটক ধ্রুপদী ভারতীয় নাটকের প্রভাব স্বীকার করেও নতুন ধরনের রীতি নির্মাণ করে নিয়েছিল। এ সব নাটকে সংস্কৃত ভাষা ও গঠনের অনুকরণঅলক্ষ্য থাকে নি। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলায় যে সব দেশজ নাট্যরীতি গড়ে উঠেছিল। তার চেহারা ছিল আলাদা। কীর্তন মঙ্গলকাব্যগীতিকা প্রভৃতির সমন্বয়ে স্বতন্ত্র ধরনের প্রদর্শ শিল্পের সৃজন প্রক্রিয়া বাঙালি সমাজে গড়ে উঠেছিল যার প্রকাশ যাত্রাপালা, ঢপকীর্তন ও অন্যান্য লোকনাট্য। এ সব নাটকের অবশ্য অঞ্চলভেদে আলাদা আলাদা চেহারা ছিল। এসব নাট্যরীতির স্বাভাবিক বিবর্তন যদি সম্ভব হত তাহলে বাঙালি তার নিজস্ব নাটক রচনার কৌশল হয়ত আয়ত্ত করে নিতেও পারত। কিন্তু এসব দেশীয় রীতিকে প্রায় অগ্রাহ্য করে উনিশ শতকে প্রতীচ্য নাট্যরীতি আবির্ভূত হল আগ্রাসী চেহারা নিয়ে। তাই নাট্যরীতিতে সমন্বয়ের বদলে দেখা দিল সংঘাত। তার ফলে আমাদের দেশজ রীতির উত্তরণ তেমন হল না। আবার প্রতীচ্য রীতিও যথেষ্ট নিজের হয়ে উঠল না। চিনদেশ অথবা জাপানে এ সমন্বয় অনেকটাই সম্ভব হয়েছিল। বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারা বজায় থাকলে বাংলা নাটকের চেহারা কি দাঁড়াত তা অবশ্য এখন আর বলা যায় না। তবে মধু কানের পালাসমূহ বিশ্লেষণ করে অন্তত খানিকটা আন্দাজ করা যায় বাংলা দেশীয় নাট্যরীতি কোন ক্রম মেনে বিকশিত হয়ে চলছিল। সে হিসেবে মধু কানের ঢপ পালার একটি অবস্থানগত ঐতিহাসিকতা রয়ে গেছে।